কাগজওয়ালা ছোটগল্প

শ্রী চিরঞ্জয় দাস

আমাদের কাগজওয়ালাটা রোজ কাগজ দিতে দেরী করে। আমাদের ফ্ল্যাটের বাকি যতসব ঘর রয়েছে তাদের ততক্ষণে অর্ধেক কাগজের খবর হজম হয়ে যায় বোধহয়। গত দিনের দুনিয়াটা ততক্ষনে ওদের কাছে বাসি রুটির মতো পুরনো হয়ে গেছে, তার সমস্ত ঘটনাবলীর আকস্মিকতা সমগ্র চমক হারিয়েছে। যেন গরম ভাতের উষ্ণতা দীর্ঘক্ষণের অপেক্ষায় শীতল স্বাদহীন পান্তায় পরিণত হওয়ার মতো। আমাদের পাশের ঘরের মল্লিকবাবু অথবা ওপরতলার মিত্রদের যখন কাগজ দিয়ে যায় তখন আমাদের নিদ্রাতুর পাড়ার আড়মোড়া ভাঙাও শুরু হয় নি। নলিনী ঘোষের বাগান বাড়ির পানকৌড়িটা বুঝিবা পাশের ঘুমকাতুরে পুকুরের জলে সবে প্রথম ডুবটা দিয়েছে। আর উল্টোদিকের ভুবনদার ঘরে যখন কাগজ দেয় তখন সুধা সবে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলছে হয়তো, বা কাজের মাসি এসে বেলে আঙ্গুল রাখছে। সুধা রাতে কখনো ম্যাক্সি পরে না। আর সারা রাত ঘুমের পর স্বাভাবিকভাবেই ওর পোশাক আলুথালু। বিস্রস্ত বসনা। বিয়ের বছর দুয়েক কেটে গেলেও আমাদের ঘুমোতে এখনো বেশ রাত হয়। দোষ কি শুধু আমার? ও সে নিজেও দিনে দিনে সুন্দরী হয়ে উঠছে!

আমি ঘুম থেকে একটু দেরী করেই উঠি। সুধার চায়ে চুমুক দিতেদিতে সামান্যতম সুখ খুঁজে পেলে সানন্দে সুধাকে রাগাতে রাগাতে আমার ঘুমের নেশা কেটে যায়। কখনো কখনো রাতভর দুষ্টুমির জন্য আমাকে কপট ভ্রূকুটি করে সুধা যখন ওর এলো চুলে খোঁপা করতে করতে ঘড়ি দেখে তখন আরো দুষ্টু হয়ে উঠতে ইচ্ছে করলেও নিজেকে সামলে নিই।

চা-পান করে আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস বাইরে একটু পায়চারি করা। তার মধ্যে মা বাবা দিদারা উঠে যান। আর তাদের প্রিয় পুত্রবধূর ঠাণ্ডা লাগলো কিনা, গলা ধরার হেতু বা শরীরে সামান্যতম উষ্ণতার কারণ এবং তদ্‌জন্য ওষুধ পত্রাদির সময় মতো ব্যবহার যখন শেষ হয় ডাক্তার দেখার আদেশ ততক্ষনে কাগজ এসে গেছে। শান্ত মৃদু ভাষিনী সুধাকে তখন দেখলে কে বলবে যে রাতের চোখ বোজার সাথে সাথে রাত রহস্যময়ী হয়ে ওঠার মাহেন্দ্রমূহূর্তে এই নারীই বালিকার মতো আব্দার ধরবে তাকে আরো আরো অনেক ভালোবাসার!

আমাদের ফ্ল্যাটের পাশের রাস্তাটায় গাড়ি চলে না। এটাকে গলি বলাই ভালো। ঠিক রাস্তা নয়। সকালে কিঞ্চিৎ শুদ্ধ বাতাস বুকে নিতে নিতে এই সময়টা আমার খুব ভালো লেগে যায় রোজ। সারাদিনের পঙ্কিলতা, ব্যস্তসমস্ত, জ্যামসর্বস্ব শহর কলকাতার হাজার ধমনীর ক্রমশ বাড়তে থাকা চাপ বা জাঞ্জটের সর্পিল প্যাঁচে আটকে পড়ে চোখের সামনে কাজের মুহূর্ত্ত গুলোকে বয়ে যেতে দেখতে দেখতে আর প্রতিমূহূর্তে এই মৃতনগরীর প্রতি বিরক্তির চোরাবানে আস্থা হারাতে হারাতেও প্রতিদিন এই সময়টার এই শহরটার প্রেমে পড়ে যাই। পুকুরের বুক থেকে উঠে আসা বাতাস এই মাঝ আশ্বিনে বেশ ঠাণ্ডা। দু'একজন কাজের মেয়েকে দেখি দেরী হওয়ার দরুন হন্তদন্ত হয়ে মন্টুদের ফ্ল্যাটে ঢুকে যাচ্ছে। পাশের আদ্যামার মন্দিরে পুরুতঠাকুর এক টা লাল জবার মালা কালীর গলায় পরাচ্ছেন। গৌরের বোন আন্না মন্দিরের সিঁড়ি মুছতে ব্যস্ত। মন্তোষের মুদির দোকানে পাঁউরুটি এলো। ঘোষবাড়ির বৃদ্ধ ভদ্রলোকটা চড়ুইদের দানা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আর যখন মুখার্জিদের ছোট মেয়েটা চুল ঝাড়তে ঝাড়তে আমার দিকে চেয়ে হাসবে ঠিক এই সময়টায়ই কাগজওলা আসে। পাড়াটার ক্রমে বাড়তে থাকা ব্যস্ততার সাথে তাল মিলিয়ে সাইকেলের বেল বাজিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটে ঢোকে কাগজওলা।

- আজ খুব দেরী হয়ে গেলো যে মৃণাল।

- হ্যাঁ দাদা। কাগজ আসতে দেরী হোলো।

ওর রোজই কাগজ আসতে দেরী হয়। আর কারো তো হয় না। আমি সবই বুঝতে পারি।

যেখান থেকে ওরা কাগজ কেনে সেখানে ঠিকঠাক গুনেটুনে নিতে বা ঠিক করে সব গুছিয়ে আনতে কিছু সময় লাগবে ঠিকই। তাই বলে রোজ দেরী হবে কেন?

একবার দেরী হবার হেতু জিজ্ঞাসা করতে মৃণাল বলেছিলো, দাদা ঘরে অসুস্থ লোক আছে তো। আজ আসতে দেরী হয়ে গেছে কাগজ আনতে।

এর কি উত্তর দেওয়া যায়?

বললাম - ঠিক আছে।

কাগজ দিয়েও কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইলো মৃণাল। বল্‌লাম,

- কিছু বলবে?

- হ্যাঁ দাদা, বাড়ির অবস্থা তো জানেনই। দয়া করে আমায় ছাড়িয়ে দেবেন না দাদা। আর দেরী হবে না। অনেকদিন ধরে আপনাদের কাগজ দিচ্ছি।

খুব কষ্ট লাগলো। প্রায় আটবছর ধরে কাগজ দিচ্ছে মৃণাল। হয়তো এই টাকাটা ওর খুবই দরকারী। তাছাড়া ছেলেটা ভালোই। মায়াবী দুটো চোখ।

বললাম - আরে না না। ওসব ভেবো না! যেমন দিচ্ছো তেমনই কাগজ দেবে। অন্য কাউকে রাখবো না।

আমি খুব সামান্যই একটা চাকরী করি। এটাকে চাকরী না বলে কাজ বললে মিথ্যেটা একটু কম বলা হয়। একটা ছোট পত্রিকার গল্পের দপ্তরটার ভার আমার ওপর। মাইনে খুবই কম। লোককে তো বলা যায় না। তাই বলতে হয় সহ-সম্পাদক। গাল ভরা একটা নাম। প্রত্যেক নামের একটা ভার থাকে। এটারও আছে বোধহয়। লোকে বেশ সম্মানের চোখে দেখে।

জীবনে কোনো বড় কাজ করিনি। আর গল্প লেখাটা কাজ নাকি? শুধু কাজের মধ্যে সুধাকে কি মন্ত্রবলে গেঁথে ফেলেছিলাম। সুধার কাছে আমি সাহিত্যিক। আমার নিজেরই ভবতে হাসি পায়। আমি ভাবি আমার মত অপদার্থকে সুধা ভালোবাসলো কি করে? তবে সুধাকে আমি নিজের চেয়ে বেশী ভালোবাসি।

এই টুকুন উপার্জনে কোন সংসারই চলে না। তারপর বাজারদর আকাশ ছোঁয়া। তাই টিউশানিও করতে হয়। তবে সংসার চলে বাবারই পেনসনের টাকায়। এই যে ফ্ল্যাট তাও বাবারই উপার্জনের টাকায়। বাবা বড় চাকুরে ছিলেন। সরকারি অফিসের। বছরখানের হলো রিটায়ার করেছেন।

সকালবেলা এই পাড়াটায় দুর্গামন্দিরের পুজোর উপলক্ষ্যে আজকেই এক লড়ি বাঁশ এলো। গলিটার মুখে যে মাঠটার মধ্যে গত শীতে যাযা হলো তার ধারের শীতলামন্দিরের পাশের ফাঁকা জায়গাটাতে দীনুঠাকুর ঠাকুর গড়ছেন। একতাল মাটির অন্তরাল থেকে ধীরে ধীরে বড় মায়া ভরা দু চোখে দুর্গা প্রতিমা আত্মপ্রকাশ করছেন। ন্যাড়া অসুরের ডানহাতটা কোনো কারনে ভেঙে গেছে। দুর্গামন্দিরের পুজো বেশ প্রাচীন। প্রায় বছর চল্লিশের পুরনো। এক ঝাঁক তুলোট মেঘ, নীলাকাশ জানিয়ে দিচ্ছে তিনি আসছেন। তার ওপর মুকুন্দদের বাড়ির পাশের পরিত্যক্ত স্থানটাতে চূড়ান্ত অযত্নে একরাশ কাশফুল বেড়ে উঠেছে। শুনেছি ওটা নাকি প্রোমোটার কিনে নিয়েছে। ওই দিকে

তাকালেই যেন ঢাকের বাজনা কানে আসে!

মৃণাল একসপ্তাহ হলো কাগজ দিতে দিতে নটা বাজিয়ে দিচ্ছে। এতো দেরী করে কাগজ পেলে যেন সকাল সকালই মেজাজটা বিগড়ে যায়। আমার চিরকালের অভ্যাস সকালে নতুন সদ্য আসা কাগজটা নিয়ে কিছুটা সময় কাটানো। শীতের এত সুন্দর সকালে মৃণালকে দুটো কথা আর শোনাতে পারলাম না। মনটা কুরকুরে হয়ে আছে। রাগ হচ্ছে না। প্রকৃতির অপার মহিমা। নাকি শরৎকালের?

এই কদিন এত দেরী করছে বলে ভেবেছিলাম আজ ওকে ধরবো। দু'কথা না শোনালেও একটু জিজ্ঞাসা করতাম এতটা দেরীর কারণ। অন্যদিন ও যখন কাগজ দিয়ে চলে যায় তখন আমি ভেতরের ঘরে থাকি নয় বাথরুমে। কিন্তু এত ভালোলাগা মন নিয়ে কাউকে বকা যায় নাকি?

সেদিন রাতে মা-বাবা প্রভাত বাবুর নতুন পুত্রবধুর সাথে আলাপ করতে গেছিলেন। প্রভাতবাবু পাড়ার পুরনো লোক। আমাদের পরিচিত। ছোট বেলায় অনেক সময় নাকি ওদের বাড়িতে সময় কাটিয়েছি আমি। বাড়িতে দিদা ছিলেন অন্য ঘরে। পত্রিকার অফিস থেকে ফিরে এসে বেশ আরামে চায়ে চুমুক দিচ্ছি। পাখার হাওয়ার জন্য দেওয়ালে রামকৃষ্ণদেবের ছবি আঁকা ক্যালেণ্ডারটা বারবার আছড়ে পড়ছে। দু'একবার শাঁখ বাজার শব্দ কানে আসছে। পাশের বাড়িতে সন্ধে দিচ্ছে বোধহয়। কোথাও ঝিঁঝি ডাকার নিরন্তর আওয়াজ। সবে নতুন মাস পড়েছে। সুধা একটা হিসেব নিয়ে মাসের খরচাপাতির যোগবিয়োগ করছে মন দিয়ে। হিসেবনিকেশের ফর্দ মেলাতে গিয়ে হঠাৎ কাগজের কথা উঠলো। সেদিন মৃণাল কাগজ দেয়েনি। কথায় কথায় মৃণালের কথা উঠলো বললাম-

- সুধা, মৃণালকে আর রাখা যাবে না।
- কেন?
- কেন বলছ। কাগজ দিতে একে দেরী করে। তার ওপর আজ আসেনি।
- দেরী কি আর ইচ্ছে করে করে, হয়ে যায় মাঝে মাঝে। তবে...
- আবার তবে কি? না। না। অনেকদিন হলো ও দেরী করছে। রোজ মানা যায় না কী?
- ওকে আমি বলবো এখন। যাতে না দেরী করে।
- না সুধা। আমি ওকে অনেকবার বলেছি। প্রত্যেকবারই বলে যে আর হবে না।

ত্রিদিববাবু আজ আসেন নি। তাই চিঠিপত্র দপ্তরটি আজ আমাকে দেখতে হচ্ছে। আমার নিজের আজ খুব একটা কাজ ছিলো না। গতকালই গোপালদাকে সামনের সংখ্যার জন্য নির্বাচিত গল্প গুলো পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার একটা গল্পও তাতে ছিলো। চিঠি গুলো পড়ছিলাম। নিতাই চা দিয়ে গেলো। ওর ছোটমেয়ের শরীরের কথা শুধোতে ও বললো যে জ্বরটা আর আসেনি। এখন বিকেল। শহুরে ব্যস্ততার ওপর খুব ধীরে আধারের চাদর নেমে আসছে। ফুটপাথের দোকানগুলোতে দুটো একটা আলো জ্বলতে শুরু করেছে। রাস্তার মোড়ের তেলেভাজার দোকানটায় রোজকার মত আজও ভিড়। অপিসঘরের পাশের রাস্তাটা দিয়ে দু একটা রিক্সা যাচ্ছে। পুজো আসন্ন। তাই রাস্তায় প্রচুর লোক।

আজ তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। তিনটাকার মুড়ি তেলেভাজার সাথে একটা বেশ ঝাল কাঁচালঙ্কা সহযোগে বিকেলের টিফিন করতে করতে বাস স্ট্যাণ্ডে চলে এলাম। চিরাচরিত নিয়ম মেনে যানবাহন ট্রাফিক আইনকে প্রহসনে রূপান্তরিত করেছে। পুজোর ব্যস্ততার সাথে হাত মিলিয়ে মানুষের বাড়ি ফেরার ব্যস্ততা দেখার মতো। ঠেলাঠেলির তোয়াক্কা না করে বছরযোলো হয় বাসে করে ফিরছে সকলে।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙলো মহালয়ার সুরে। উষাকালে পক্ষীকুলের প্রথম কলতানের সাথে তাল মিলিয়ে কোন অত্যাশ্চর্য ম্যাজিকবলে একরাশ খুশীর গুঁড়ো গুঁড়ো রেনু যেন কেউ ছড়িয়ে দিচ্ছে চতুর্দিকে। সুধা বিছানা ছাড়ার সময় ওর কুচো চুলগুলো কপালের দিকে এসে পড়ায় ওকে খুব সুন্দরী দেখাছিলো। এত আনন্দ চারিদিকে বুঝি কোন মন্ত্রবলে আমাকেও মাতাল করে তুলছিলো। দুষ্টুমি করে সুধার গলায় মুখ গুঁজে দিতেই ও কপট রাগ দেখিয়ে পালিয়ে গেল!

সকাল বেলা নীচে নেমে পায়চারি করছি আর দেখতে পাচ্ছি গাছের পাতার আড়ালে দেবীপক্ষের প্রথম সূর্যালোক পরানবাবুর বাড়ির দেওয়ালে একটা অদ্ভুত নক্সার সৃষ্টি করেছে। দুর্গামন্দিরের দুর্গাদালানের রঙ করা প্রায় শেষের দিকে। আর ঐদিকে দুর্গাঠাকুরও প্রায় অসুরকে বধ করে ফেলেছেন। শুধু দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিংহটির এখনও কেশর না থাকায় পূর্ণতা পায় নি। তবে মোহনঠাকুরের সব দিকেই দৃষ্টি। তাঁর অভিজ্ঞ হাতে ধীরে ধীরে দেবী দুর্গা প্রাণবন্ত হয়ে উঠছেন। মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। বুঝি আকাশে হাত ডোবালে একরাশ নীল উঠে আসবে।

নতুন কাগজওলা সময় মতো কাগজ দেয়। সকলের প্রথম আড়মোড়া ভাঙার সাথে সাথে চোখ খুলেই কাগজ পেয়ে যাই। সেই মাসেই মৃণালকে আমি ছাড়িয়ে দিই দিন তিনেক মৃণাল কাগজ দিতেই এলো না। পরে একদিন মৃণাল এসেছিল। সুধার সাথে দেখা হয়েছিলো ওর। ওকে ছাড়িয়ে দেওয়ার কথা শুনে ও নাকি কোনো কথা না বলে চলে গিয়েছিল। শুনে কষ্ট হয়েছিলো আমার। কিন্তু আমিও বা কি করি?

পৃথিবীর ঘটনার সাথে যখন তাল মিলিয়ে চলছি ঠিক সময় ঠিক খবরটা আত্মস্থ করে, ঠিক তখনই এই সুন্দর মহালয়ার সকালটাতে মৃণালের সাথে দেখা হয়ে গেলো, একটা অপরাবোধ থেকে বোধহয় নিজের অজান্তে ওকে এড়িয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু মৃণালই ডেকে উঠলো, দাদা।

- আরে তুমি। কেমন আছ।
- চলছে, আপনি?
- ভালো।
- বৌদি?
- ভালোই।
- এখন দাদা আর কাগজ দিতে দেরী হয় না।
- তাই... আমতা আমতা করতে লাগলাম।
- দেরী করার লোকটা আর নেই।
- মানে?
- আমার বউটার, দাদা, খুব খারাপ রোগ হয়েছিল। তা রোজই বেরোবার সময় ওকে ওষুধ খাইয়ে আসতে হতো। আর কেউ তো নেই। সেদিন কাগজ আনার সময় খুব করে হাত ধরে পাশে বসতে বললো। সেদিনই... । খুব কষ্ট পেলো ও দাদা। তারপর কদিন আর আসতে পারলাম না। কিছুই ভালো লাগলো না দাদা। আবার বেরিয়েছি। পেটের জন্য।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মৃনাল বিদায় নিলো। যে প্রতিদিন নিত্যনতুন খবর কেরি করে তার নিজের খবর কি কেউ রাখে? যে খবর বিক্রি করে বাঁচে তার নিয়মানুবর্তিতার এদিকওদিক হলে রুষ্ট হই। এইসব ছোট ছোট খবরের অন্তরালে কত দু:খ, বেদনা, দীর্ঘশ্বাস চাপা পড়ে থাকে। কাগজের প্রিন্ট, কালি গন্ধ, শব্দ তাদের কোনো মর্যদাই দেয় না।